

ষষ্ঠ অধ্যায় জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলন

জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশনালিজম নিয়ে শুধু প্রবন্ধ নয়, অনেক বইও লেখা হয়েছে। এর সংজ্ঞা, স্বরূপ নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। আমরা এখানে বিতর্ক নয়, সাধারণ একটি আলোচনা করব।

প্রতিটি দেশের মানুষেরই নিজ জাতির ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে একটি আবেগ আছে। একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়েও সে আবেগ থাকতে পারে। জাতীয়তাবাদ সে আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

মার্কসবাদীরা মনে করেন, 'প্রধানতঃ পুঁজিবাদী বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশক আদর্শ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। এর দুটি দিক আছে, আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ যা প্রকাশ পায় অপর জাতি/রাষ্ট্রকে আক্রমণ দখল বা জাতিগত নিপীড়নের মাধ্যমে। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাজি জার্মানীর জাতীয়তাবাদ। অন্যটি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী/শোষক শাসক/রাষ্ট্রের থেকে মুক্তি যেমন ১৯৭১ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বলীয়ান হয়ে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

বাংলার জাতীয়তাবাদের ধারা খুঁজতে গেলে আঞ্চলিকতার বিষয়টিও আলোচনায় আনতে হবে। আগে উল্লেখ করেছি বাংলার বিভিন্ন নরগোষ্ঠী বসবাস করতো যাদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ক্ষীণ। সভ্যতার বিস্তৃতির ফলে, বিভিন্ন কৌমের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌমের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল বৃহত্তর কৌম, যেমন-বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি। এই কৌমচেতনা প্রাচীন যুগে তো বটেই, মধ্যযুগেও ছিল এবং এখনও বহমান।

কৌমচেতনার সঙ্গে ক্রমে যুক্ত হয়েছিল আঞ্চলিক স্মৃতি এবং চেতনার। বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদগুলি পাল (আনুমানিক ৭৫০ থেকে ১১৭৪ খ্রিষ্টাব্দ) ও সেন রাজারা (আনুমানিক ১০৯৫-১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আঞ্চলিক চেতনা তবু লুপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বভারতের পটভূমিকায় জাতীয়, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক চেতনার কথা আলোচনা করা দরকার। জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশ হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপে এবং এর পেছনে কাজ করেছিল পুঁজিবাদী শক্তি। এর কারণ, বিকাশমান বুর্জোয়া শ্রেণী চেয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের বেড়াজাল ভেঙ্গে নতুন বাজারের সৃষ্টি করতে যা co-extensive with a definite culturally-politically unified or unifiable territory, could be brought into existence with popular support. ভাষা ছিল এ চেতনার একটি প্রধান মাধ্যম। বুর্জোয়ারা, নিজ রাজনৈতিক

স্বার্থে তখন সচেতন করে তুলেছিল জনগণকে তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সত্তা সম্পর্কে এবং এ জন্যে প্রয়োজনবোধে সৃষ্টি করা হয়েছিল বিভিন্ন ‘মিথ’। এটিই হল জাতীয়তাবাদ এবং তা সাহায্য করেছিল বুর্জোয়াদের জনগণকে সংগঠিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনাধীন রাষ্ট্রগুলিতে জাতীয় আন্দোলন ছিল প্রাথমিকভাবে উপনিবেশের বিরুদ্ধে, যাতে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে পারে এবং নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সমাজকে পুঁজিবাদী সমাজে রূপান্তরিত করতে পারে। সুতরাং জাতীয়তাবাদের উৎস শুধু হৃদয়াবেগ বা দেশের প্রতি ভালবাসাই নয়, অন্য কিছুও।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে দেখা গেছে, নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশরা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল যার সঙ্গে যোগ ছিল মেট্রোপলিটনের। ঐ সময় বিভিন্ন অঞ্চলের অসংহত বুর্জোয়াদের উৎসাহিত করা হয়েছিল বিদেশী পুঁজি ও ব্যবসার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে। উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক বা সর্বভারতীয় পর্যায়ে উঠতি ভারতীয় বাঙালি বুর্জোয়াদের স্থান ছিল অধস্তন। কিন্তু তারা চায়নি নিজেদের বাজারের ওপর বিদেশীদের আধিপত্য। নিজেদের বিকাশের জন্যে তাদের প্রয়োজন ছিল ঐ বাজারের। কিন্তু এ বিরোধী ভূমিকা কখনও ছিল না বিপ্লবাত্মক বরং তা ছিল সমঝোতাপূর্ণ। সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, ঐ সময়ে বুর্জোয়ারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করে চলেছিল এবং গুরুত্ব আরোপ করেছিল এর বিরুদ্ধে ভারতীয় জনগণের ঐক্যের।

প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে ভারতে জাতীয় চেতনা বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক আমলে, আরো নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটেছিল এবং এর দু’টি ধারা ছিল বহুমান— একটি সর্বভারতীয়, অপরটি আঞ্চলিক। প্রথমটির ভিত্তি ছিল— সর্বভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য। দ্বিতীয়টির ভিত্তি ছিল স্ব স্ব অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য এবং নিজ অঞ্চলের লোক সমষ্টির ঐ অঞ্চলের বাজার ও সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ। জাতীয় চেতনার মধ্যে আঞ্চলিক চেতনার এই অবস্থানের ভিত্তিতে আবার অনুপ্রবেশ করেছে প্রাচীন বাংলার অতীত এবং ঐতিহ্য।

প্রাচীন বাংলা সম্পর্কে নীহাররঞ্জন রায় লিখেছিলেন, “ভূমি নির্ভর কৃষি জীবনের কারণে” কৌম ও আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। আঞ্চলিক চেতনার মধ্যে ভূমি নির্ভরতার এই অনুপ্রবেশ ক্রিয়াশীল দেখতে পাই বিকাশমান মধ্য বা বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে। ঐ সময় একই সঙ্গে সর্বভারতীয়, আঞ্চলিক (বাংলা) ও উপ-আঞ্চলিক (পূর্ববঙ্গ)- এই চেতনাত্রয় কাজ করেছিল। বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য সর্বভারতীয় পরিসরে সুবিধা ছিল বেশি। সে জন্যে সে চেয়েছিল সর্বভারতীয় চেতনার বিকাশ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার আঞ্চলিক চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল সে, যেমন বঙ্গভঙ্গের সময়। কলকাতার বিরুদ্ধে আবার পূর্ববঙ্গের কাঠামোগত দুর্বল মধ্যশ্রেণীর উপ-আঞ্চলিক চেতনা কাজ করেছিল। ঐ মধ্যশ্রেণীর মতে, তাদের অঞ্চলের উৎপাদিত কাঁচামাল চলে যাচ্ছিল কলকাতায়, কিন্তু পাচ্ছিল না ন্যায্যমূল্য। পূর্ববঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থাও ছিল অবহেলিত। এ সব কিছুর পরিচয় পাব আমরা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর বাহন সংবাদ/সাময়িক

পত্রগুলিতে। এই চেতনায় সহায়তা করেছিল আবার ভূমিনির্ভর জীবন, শিল্পের অভাব। এই উপ-আঞ্চলিক চেতনা পূর্ববঙ্গবাসীর মন থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনও। সে চেতনা আবার বাঙালি জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনে (১৯৭১) সহায়তা করেছিল। ভাষা এবং জাতি হিসেবে বাঙালির 'একত্বতা' গড়ে উঠলেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের এমন কিছু আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে যা দুটি অঞ্চলকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। প্রকৃতিগত দিক থেকেও পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পার্থক্য আছে। কারণ, পূর্ববঙ্গ নদীমাতৃক অঞ্চল। এছাড়া সংস্কৃতিগতভাবেও যে প্রাচীনকালে দুটি অঞ্চলের খুব মিল ছিল এমন কথা বলা যায় না। যেমন রাঢ় (বা পশ্চিমবঙ্গ)-এর ওপর প্রভাব পড়েছিল বেশি উত্তর ভারতীয় 'কালচারাল ইডিওমস'-এর যার উদাহরণ ঐ অঞ্চলের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, অনেকে প্রশ্ন তুলতে পারেন এই বলে যে, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব রাঢ় অঞ্চল থেকে কিছুটা কম ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক প্রশ্নে প্রায় এক এবং রাঢ় ও সংলগ্ন অঞ্চল ঐ প্রশ্নে স্বতন্ত্র। এর একটি কারণ বোধ হয় এই যে, পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের আগমন এবং তারপর তাদের সংগঠিত ধর্মজীবন ও কৃষি বাণিজ্যের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরাঞ্চলে। এক কথায় মুসলমানদের আগমন, মসজিদ নির্মাণ ও তাকে ঘিরে পতিত জমি উদ্ধার ও সংগঠন, বিশেষ করে সুফীদের প্রভাব গ্রাস করেছিল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে। এখনও ঐসব অঞ্চলে সুফীদের সম্পর্কে বিভিন্ন কিংবদন্তী সেই স্মৃতিই বহন করে। এভাবে, একসময়, উত্তরাঞ্চল রাঢ়ের সংলগ্ন ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে ঐ প্রশ্নে তা পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিকতার বলয়ে লীন হয়ে গিয়েছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে, ঐ ভূখণ্ডের মানুষের মধ্যে এই একক বা ভৌগোলিক সীমানা স্থান করে নিয়েছিল যা জেনারেশনের পর জেনারেশনের ভালোবাসায় সিক্ত হয়েছে। এই বোধ ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে ১৯৭১ সালে যখন ঘোষণা করা হয়েছে এই একক নিয়েই গঠিত হবে বাংলাদেশ।

ক. সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও বাঙালি সংস্কৃতির উজ্জীবন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ১৯৬৬ সালে ছয় দফা ঘোষণা করেছিলেন। এই একই সময় বাঙালির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনও পরিচালিত হয়।

ছয়দফা আন্দোলন দমনের জন্য কেবল রাজনৈতিক নেতা কর্মীদেরকে গ্রেফতার কিংবা গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেই সরকার ক্ষান্ত হয়নি। তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের ভাষা ও সাংস্কৃতির ওপর নগ্ন হামলা চালায়। নিম্নে এ বিষয়ে সংকিঞ্চণ্ড আলোকপাত করা হলো :

রবীন্দ্রসঙ্গীতের নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা

১৯৬৭ সালের জুন মাসে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ইতিপূর্বে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের

সময় পাকিস্তান রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ থাকে। বাজেট অধিবেশনে রাজশাহী থেকে নির্বাচিত বিরোধীদলীয় সদস্য মজিবর রহমান চৌধুরীর এক প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন মন্তব্য করেন যে, পাকিস্তানী আদর্শের সঙ্গে না মিললে রেডিও-টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়া হবে। খান এ.সবুর পহেলা বৈশাখ উদযাপন এবং রবীন্দ্র-সংগীতকে হিন্দু-সংস্কৃতির অংশ বলে মন্তব্য করেন। জাতীয় পরিষদের এই বিতর্কের সংবাদ ঢাকার সংবাদপত্রে (দৈনিক পাকিস্তান ও অবজারভার, ২৩-২৮ জুন ১৯৬৭ দ্রষ্টব্য) প্রকাশিত হলে বাঙালি বুদ্ধিজীবীরাও বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ২৫ জুন ১৯৬৭ আঠারো জন বুদ্ধিজীবী সরকারি বক্তব্যের সমালোচনা করে এক বিবৃতি দেন :

...সরকারি মাধ্যম হতে রবীন্দ্রসংগীতের প্রচার হ্রাস ও বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আমরা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলাভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তার সংগীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও ভিন্নতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে। সরকারি নীতি নির্ধারণের সময় এই সত্যের গুরুত্বকে মর্যাদা দান করা অপরিহার্য।

এই বিবৃতির পাল্টা আরেকটি বিবৃতি দৈনিক পাকিস্তানে ২৯ জুন ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষর করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচ জন শিক্ষক। তারা বলেন :

....(১৮ জন বুদ্ধিজীবীর) বিবৃতির ভাষায় এই ধারণা জন্মে যে স্বাক্ষরকারীরা বাংলাভাষী পাকিস্তানী ও বাংলাভাষী সংস্কৃতির মধ্যে সত্যিকারের কোনো পার্থক্য রয়েছে বলে স্বীকার করেন না। বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সংস্কৃতির সম্পর্কে এই ধারণার সঙ্গে আমরা একমত নই বলে এই বিবৃতি দিচ্ছি।

একই দিন (২৯-৬-৬৭) দ্বিতীয় আরেকটি বিবৃতি দৈনিক পাকিস্তানে ছাপা হয়। এতে স্বাক্ষরদাতা ছিলেন ৪০ জন। বিবৃতিতে তারা মন্তব্য করেন :

রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কে ১৮ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি মারাত্মক। ...যে তমুদনিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা, উপরোক্ত বিবৃতি মেনে নিলে সে ভিত্তিই অস্বীকৃত হয়। এই কারণে উপরোক্ত বিবৃতিকে আমরা শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, অত্যন্ত মারাত্মক এবং পাকিস্তানের মূলনীতি বিরোধী বলেও মনে করি।

শেষোক্ত বিবৃতিদাতারা ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে এক সভা করে 'নজরুল একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। তারা একটা বিবৃতিও প্রচার করেন। বিবৃতিতে তারা বলেন।

...রবীন্দ্র সংগীতের ভাব, ভাষা ও সুরের কোনোটার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তৌহিদবাদী জনসাধারণের তিলমাত্র যোগ নাই। রবীন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য ও কৃষ্টি পূর্ব পাকিস্তানী, তমুদুনের সম্পূর্ণ বিপরীত...।

এইভাবে কিছু বুদ্ধিজীবীর সমর্থন পেয়ে সরকার ১৩৭৪ সালের ২২ শ্রাবণের পূর্ব মুহূর্তে (আগস্ট ১৯৬৭) বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ করে দেয়। এর দুবছর পর উনসত্তরের গণআন্দোলনের জোয়ারে উক্ত নিষেধাজ্ঞা ভেসে যায়। রেডিও-

টিভিতে রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ হয়ে গেলে ঢাকার বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা বিশেষত 'ছায়ানট', 'বুলবুল ললিতকলা একাডেমী' ও 'ঐক্যতান' রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করে সাহসিকতার পরিচয় দেয়। এ সময় বদরুদ্দীন উমর লিখিত সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কিত দুটো বই 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা' সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ আন্দোলনকে খুবই অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত করেছিল।

বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রয়াস

আইয়ুব-মোনেম চক্র কেবল রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা বাংলাভাষা সংস্কার করে একটি 'জাতীয় ভাষা' প্রচারের চেষ্টা শুরু করে। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ড. ওসমান গণি বাংলা বিভাগের ড. কাজী দীন মুহাম্মদের নেতৃত্বে ভাষা ও বানান সংস্কারের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করেন। ঐ কমিটির সুপারিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে গৃহীত হয়। ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই এবং অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীও এর বিরোধিতা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়নি। উনসত্তরের গণআন্দোলনে তা চাপা পড়ে যায়।

খ. শেখ মুজিবুর রহমানের ৬-দফা আন্দোলন

ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি

স্বাধীন পাকিস্তানের শুরু থেকেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করা হয় এবং প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হয়। প্রদেশের গভর্নরের নিয়োগদান করতেন গভর্নর জেনারেল। স্বভাবতই প্রাদেশিক গভর্নর সবসময় গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। এমনকি প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদের গঠন, দায়িত্ব বন্টন ও কার্যকাল বিষয়েও গভর্নরের ওপর গভর্নর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল। The Pakistan Provincial Constitution (Third Amendment) Order, 1948. এর মাধ্যমে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করা হয়। এতে বলা হয় গভর্নর জেনারেল যদি মনে করেন যে, পাকিস্তান কিংবা এর কোনো অংশের শান্তি ও নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে, কিংবা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যাতে প্রাদেশিক সরকার দায়িত্ব পালনে অপারগ, সেক্ষেত্রে গভর্নর জেনারেল উক্ত প্রদেশের সকল ক্ষমতা নিজ হাতে গ্রহণ করতে পারবেন (তবে প্রদেশের হাইকোর্ট এই নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে)। ১৯৪৯ সালে PRODA (Public and Representative Offices [Disqualification Act] জারির মাধ্যমে প্রাদেশিক মন্ত্রীদেরকে পরোক্ষভাবে পরাধীন করা হয়। এই আইনে হাইকোর্টের বিচারককে দিয়ে যে কোনো সময় যে কোনো মন্ত্রীর কাজের তদন্ত করা যেত এবং উক্ত তদন্তে কোনো অনিয়ম কিংবা দুর্নীতি চিহ্নিত হলে উক্ত মন্ত্রীকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য সকল রকম সরকারি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করা যেত। এর ফলে

প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ সব সময় কেন্দ্রের অনুগত থাকতেন।

প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার আরেকটি মাধ্যম ছিল কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্যবর্গ। প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ পদে তারা অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু তাদের চাকরি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে তারা প্রাদেশিক সরকারের আদেশ-নিষেধ মানতেন না। ফলে প্রদেশে আমলাতন্ত্র খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই আমলাগোষ্ঠীতে বাংলাদেশের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিল না। এমনকি ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলা সচিবালয়ে একজন বাঙালি সচিবও ছিলেন না। অবাঙালি সচিবগণ পূর্ব বাংলার স্বার্থকে কখনই বিবেচনায় আনতেন না, বাঙালি অফিসারদের সঙ্গেও তারা ভালো ব্যবহার করতেন না, তারা ছিলেন জনবিচ্ছিন্ন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের অফিসগুলিতে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব ছিল নামমাত্র। পররাষ্ট্র দপ্তর ও কূটনৈতিক অফিসগুলিতে সাতজন সহকারী সেক্রেটারির মধ্যে একজনও পূর্ববঙ্গের লোক নেই। বায়ান্নজন সুপারিনটেনডেন্টের মধ্যে মাত্র তিনজন এবং দুশো ষোলজন সহকারীর মধ্যে মাত্র পঁচিশজন পূর্ববঙ্গের অধিবাসী।

দেশের সামরিক বাহিনীতেও বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না বললেই চলে। ১৯৫৬ সালের এক হিসেবে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব ছিল নিম্নরূপ :

পদ	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
জেনারেল	১	০
লে. জেনারেল	৩	০
মেজর জেনারেল	২০	১
ব্রিগেডিয়ার	৩৫	০
কর্নেল	৫০	০
লে. কর্নেল	১৯৮	২
মেজর	৫৯০	১০

সকল বাহিনীর সদর দফতর ছিল পাকিস্তানে।

অর্থনৈতিক দিকেও প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পায়। যদিও ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে আয়ের মূল উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে দেয়া হয়েছিল, তথাপি উক্ত আয় কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে বন্টনের একটা বিধি ছিল। স্বাধীনতার পর আয়কর পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যায়। বিক্রয়-কর, যা ইতিপূর্বে প্রদেশের হাতে ছিল তা ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে Jute export duty এর কমপক্ষে ৫০% পাট-রফতানিকারী প্রদেশ লাভ করত। কিন্তু স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই ঐ নিয়ম বদলানো হয় এবং প্রদেশ কতভাগ পাবে তা গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনও গণপরিষদের

১৯৫১-৫২ সালে বাজেট অধিবেশনে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক করুণ দশার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পূর্ববাংলার বাজেট ঘাটতি বছর প্রতি ৪/৫ কোটি টাকার, কিন্তু এই ঘাটতি প্রশাসনিক ব্যর্থতার জন্য ছিল না, এটা ছিল প্রদেশের আয়ের উৎসসমূহ কেন্দ্রের হাতে নিয়ে নেয়ার কারণে।

১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার যেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করেছে ৪২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা, পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয়ের পরিমাণ ৭৯০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। এই সময়ে বিদেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা— এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। যার ফলে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশাল বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বাজেট বরাদ্দের বৈষম্যের আরেকটি নমুনা নিম্নরূপ :

এবারের (১৯৫১) উদ্ধৃত পাক বাজেটে শিক্ষাখাতে কোনো প্রদেশের জন্য কত ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাই দেখা যাক : করাচি ৪০ লক্ষ ১৪ হাজার, মাথাপিছু ৪ টাকা ৩ আনা ৩ পাই; সিন্ধু ১০ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৬ পাই; সীমান্ত প্রদেশ ১১ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই; সীমান্তপ্রদেশ ১১ লক্ষ, মাথাপিছু ৩ আনা ৩ পাই; পূর্ববঙ্গ ৭১ হাজার, মাথাপিছু ১ পাইয়ের ৩ ভাগের ১ ভাগ।

উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহের সঙ্গে বাংলাভাষার আন্দোলন পূর্ববাংলার মানুষের মনে মুসলিম লীগ ও সরকারের প্রতি ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টির সৃষ্টি করে। পূর্ববাংলায় অধিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি জোরদার হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তান ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক ব্যবস্থা যে কতটা দুর্বল ছিল তা এই যুদ্ধের সময় স্পষ্ট হয়ে যায়। যুদ্ধের সত্তেরো দিন প্রশাসনিক দিক দিয়েও এই প্রদেশ কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যা দেশভাগের সময় থেকেই উচ্চারিত হচ্ছিল, তা পাক-ভারত যুদ্ধের পর আরো জোরদার হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে আওয়ামী লীগ। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর 'কপ' (Combined opposition party,) নিক্রিয় হয়ে যায়। 'কপ' এর পক্ষ থেকে কিছু বক্তব্য বিবৃতি দেওয়া হয় জাতীয় পরিষদের সভায়। বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলগুলোর, যেমন-ন্যাপ, নেজাম ইসলামী, মুসলিম লীগ, জামায়েত ইসলামী প্রভৃতির নেতৃত্বে ছিলেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানীরা। এন.ডি.এফ-এর নূরুল আমিন, হামিদুল হক চৌধুরী, আতাউর রহমান খান প্রমুখ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। এমতাবস্থায় আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত করে।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পরপরই স্বায়ত্তশাসনের প্রবক্তাদের অন্যতম শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় অতি আবশ্যিক হয়ে পড়েছে। পূর্ব পাকিস্তানকে সর্ববিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। শুধু ঘোষণা দিয়েই শেখ মুজিব ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করেন। ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের

নেতৃবৃন্দের এক কনভেনশনে, যা আইয়ুব খান কর্তৃক তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরের বিরোধিতা করার জন্য আয়োজন করা হয়েছিল, সেখানে (৬-৬-১৯৬৬ তারিখে) শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন। উক্ত কনভেনশন মূলত পাকিস্তানের ডানপন্থী দলসমূহ নিয়ে গঠিত ছিল। কনভেনশনে উপস্থিত ৭৪০ জন প্রতিনিধির মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ছিলেন মাত্র ২১ জন। উক্ত ২১ জনের মধ্যে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের অপর ৪ জন নেতা। ন্যাপ এবং এন.ডি.এফ উক্ত কনভেনশনে যোগদান করেনি। এই কনভেনশনে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করলে উপস্থিত ৭৩৫ জন প্রতিনিধি তা তাত্ক্ষণিকভাবে নাকচ করে দেন। এর প্রতিবাদে শেখ মুজিব তার ছোট প্রতিনিধিদল নিয়ে সম্মেলনস্থান ত্যাগ করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসেন।

শেখ মুজিব ৬ দফা দাবি উপস্থাপন করেন ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬। ৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবাদপত্রে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাপা হয়। এই দাবিগুলি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অনেক নেতা অবগত ছিলেন না। বিষয়টি উপস্থাপনের পূর্বে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদন নেয়া তো দূরের কথা—কমিটির সামনে তা পেশই করা হয়নি। ফলে অনেক নেতা-কর্মী ক্ষুব্ধ হন, এবং অনেকে হন বিভ্রান্ত। তবে “৬ দফার প্রতি আওয়ামী লীগের তরুণ-নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেলো।” প্রবীণ নেতাদের আপত্তি বা গড়িমসি সত্ত্বেও তরুণ কর্মীরা ‘বাঙালির দাবি ৬ দফা’, ‘বাঁচার দাবি ৬ দফা’, ‘৬ দফার ভিতরেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন নিহিত’ ইত্যাদি স্লোগান সংবলিত পোস্টারে পোস্টারে দেয়াল ছেঁয়ে ফেলেন। কেবল তাই নয়, ওয়ার্কিং কমিটির কোনো সভা অনুষ্ঠানের পূর্বেই ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৬৬) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ব্যানারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানের নামে “আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা-কর্মসূচি” শীর্ষক এক পুস্তিকা বিলি করা হয়। উক্ত পুস্তিকায় ৬ দফার দাবিগুলো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়।

ছয় দফার বিবরণ

- এক. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করত পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।
- দুই. ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।
- তিন. এই দফায় মুদ্রা সম্পর্কে দুটি বিকল্প প্রস্তাব দেয়া হয়। এর যে কোনো একটি গ্রহণের প্রস্তাব রাখা হয় :
(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিয়োগযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা অনুসারে কারেন্সি

কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র 'স্টেট' ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সি থাকিবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

চার. সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা-কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।'

পাঁচ. এই দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হয় :
১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।
২. পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানি-রফতানি চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।'

ছয়. এই দফায় পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের সুপারিশ করা হয়।

আওয়ামী লীগের সভায় ছয় দফার অনুমোদন

১৩ মার্চ ১৯৬৬ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদন করা হয়। মওলানা তর্কবাগীশ এবং আরো কিছু প্রবীণ নেতা ছয় দফার বিরোধিতা করেন। ওয়ার্কিং কমিটিতে অনুমোদিত হলেও তা পার্টির কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদনের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কাউন্সিল অধিবেশন বসে ১৮ ও ১৯ মার্চ ১৯৬৬। পার্টির সভাপতি মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ ৬ দফার বিরোধিতা করে সভাস্থল ত্যাগ করলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম সভার কাজ চালিয়ে যান। এই সভায় ছয় দফা কর্মসূচি অনুমোদিত হয়। তাছাড়া নতুন ওয়ার্কিং কমিটিও গঠিত হয়।

ছয়দফা সম্পর্কে মুজিবের ব্যাখ্যা

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে ১১-২-৬৬ তারিখে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব তাঁর দলের ছয় দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, পাক ভারত যুদ্ধের পর এটা পরিষ্কার হয়েছে পাকিস্তানের সংহতি ও অখন্ডতা রক্ষা করতে হলে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে এর উভয় অংশকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সকল বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে হবে। একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে শক্তিশালী করলেই যে রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে— এমনটি ঠিক নয়। বরং একটি যুক্তরাষ্ট্রের সকল ফেডারেটিং ইউনিটগুলোকে শক্তিশালী করতে পারলেই উক্ত রাষ্ট্রটি শক্তিশালী হবে। সুতরাং পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে এবং এর উভয় অংশের মধ্যে সংহতি বৃদ্ধি করতে হলে ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে হবে।

স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে অন্য দলের নেতাদের মনোভাব

আওয়ামী লীগ যে সময় ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের কিছু দল ও নেতাও সংসদীয় গণতন্ত্র কিংবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি করছিলেন। যদিও এসব দল কিংবা নেতা শেখ মুজিব-বিরোধী ছিলেন কিন্তু শেখ মুজিবের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তারা উপেক্ষা করতে পারেননি।

জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা নূরুল আমিন, যিনি এক সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং যার মুখ্যমন্ত্রিত্বের আমলে পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন সংঘটিত হয় সেই নূরুল আমিনও বলতে শুরু করেন যে, দেশের অখন্ডতা ও সংহতি নির্ভর করে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের আলোকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমে। তিনি মন্তব্য করেন যে আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট-শাসিত সরকার দিয়ে দেশের ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব নয়।

পূর্ব পাকিস্তানের আরেক প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান বলেন যে, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার একমাত্র উপায় হল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা। তার মতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি ক্ষমতা প্রদেশসমূহকে প্রদান করতে হবে।

তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ডেপুটি নেতা (১৯৬৫-৬৯) শাহ আজিজুর রহমান ১৯৬৫-৬৬ সালের জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার মাধ্যমেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা সম্ভব।

উপরের আলোচনা থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে স্বায়ত্তশাসনের দাবিটি একটি সার্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়। কিন্তু এই দাবিকে সাংগঠনিকস্বরূপ দেয়া ও দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি গণআন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ।

শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সারাদেশ জুড়ে ছয়দফার প্রচার শুরু করেন। ছয়দফা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এতে করে আইয়ুব-মোনেম চক্র আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। শুরু হয় জেল-জুলুম। শেখ মুজিব যেখানেই জনসভা করতে যান সেখানেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। একটা মামলা দায়ের করা হয়, আবার জামিনও দেয়া হয়। ৬ দফার প্রচারণার এক পর্যায়ে ৮ মে ১৯৬৬ শেখ মুজিব দেশরক্ষা আইনে গ্রেফতার হন। এই গ্রেফতারের পূর্বে ২০ মার্চ থেকে ৮ মে পর্যন্ত ৫০ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ভাষণ দেন। এই সময়সীমার মধ্যে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে তিনি ৬ দফার পক্ষে যে অভাবনীয় জনমত সৃষ্টি করেন, তা সত্যিই এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

শেখ মুজিবই নন, ১০ মে ১৯৬৬ সালের মধ্যে দলের প্রায় ৩৫০০ নেতা-কর্মী গ্রেফতার হন। কিন্তু শেখ মুজিব তার আগেই সব কিছু গুছিয়ে এনেছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে কর্মী বাহিনী যাতে কাজ চালিয়ে যেতে পারে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন তাঁর সংগঠনকে। ইতোমধ্যে ছাত্রলীগও ছয়দফার প্রচারণায় জড়িয়ে পড়ে। সে-সময় আবদুর রাজ্জাক ছিলেন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ছাত্র ইউনিয়নের সহায়তায় আবদুর রাজ্জাক ৬ দফার ৫০,০০০ হাজার লিফলেট ছাপিয়ে জনগণের মধ্যে বিলি করেছিলেন। ন্যাপের যে-অংশ ৬ দফার সমর্থক ছিলেন তারা সংবাদ থেকে ৬ দফার লিফলেট ছাপিয়ে দিতেন।

শেখ মুজিবের গ্রেফতারের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ ৭ জুন ১৯৬৬ গোটা প্রদেশ জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। দেশের শ্রমিকশ্রেণী প্রথমবারের মতো একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এতদিন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে আওয়ামী লীগের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না। কিন্তু ৭ জুনের হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের শ্রমিকরা জড়িয়ে পড়ে।

হরতালের খবর সংবাদপত্রে ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল, তাই ৭ জুনের হরতালের বিবরণ কোনো সংবাদপত্রে পাওয়া যায় না। আবু আল সাঈদ তাঁর গ্রন্থে কোনো রেফারেন্স ছাড়াই ৭ জুনের নিম্নলিখিত বিবরণ দিয়েছেন :

১৯৬৬ সালের ৭ জুন সকাল থেকেই হরতাল শুরু হল ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ শহরে। সকাল নয়টার দিকে তেজগাঁও শ্রমিক এলাকায় প্রচণ্ড বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালালে বেঙ্গল বেভারেজে চাকরিরত সিলেটের অধিবাসী মনু মিয়া ঘটনাস্থলেই মারা যায়। মনু মিয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে শ্রমিক সমাজ। তাদের সাথে যোগ দেয় ছাত্র জনতা। তারা তেজগাঁয় সকল ট্রেন থামিয়ে দেয়। তেজগাঁ স্টেশনের কাছে নোয়াখালীর শ্রমিক আবুল হোসেন (আজাদ এনামেল গ্র্যান্ড এ্যালুমিনিয়াম কারখানা) ই.পি.আর.-এর রাইফেলের সামনে বুক পেতে দেন। ইপিআর বাহিনী তাঁর বুকও গুলি চালায়। অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত এলাকায় শ্রমিক এবং আওয়ামী লীগ-ছাত্রলীগের কর্মীরা ঢাকা শহর উত্তাল করে তোলে। নারায়ণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কাছে পুলিশের গুলিতে ৬ জন শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেন ঘটনাস্থলেই। ফলে বিক্ষোভ-প্রতিবাদে সর্বস্তরের শত শত মানুষ রাজপথে নেমে আসে। পুলিশের উস্কানির মুখে জনগণ থানার মধ্যে ঢুকে যায় এবং যাদের

শ্রেফতার করা হয়েছিল তাদের ছিনিয়ে নিয়ে আসে। সন্ধ্যার পরপরই ঢাকার শ্রমিক এলাকাগুলোতে কারফিউ জারি করা হয়। শ্রেফতারের সংখ্যাও সন্ধ্যার মধ্যে দেড় হাজার ছাড়িয়ে যায়।

৮ জুনের সংবাদপত্রে কেবল সরকারি প্রেসনোট ছাপা হয়। পাকিস্তান অবজারভার চতুরতার সঙ্গে উক্ত প্রেসনোট ছাপে। অবজারভার নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ প্রেসনোটটি পত্রিকায় ছাপে :

“We are not publishing our staff. correspondents’ reports on the incidents owing to some unavoidable circumstances-‘Editor’

উক্ত প্রেসনোটে ৭ জুনের হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রেসনোটে যদিও ঘটনার সত্য বিবরণ কম থাকে, তথাপি ৭ জুনের হরতাল বিষয়ে দেয়া সরকারি প্রেসনোটটি থেকে হরতালে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের চিত্র পাওয়া যায়। প্রেসনোটটি নিম্নরূপ :

ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলিতে ১০ জন নিহত
(সরকারি প্রেসনোট)

ঢাকা ৭ই জুন, আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতাল ৭-৬-১৯৬৬ তারিখে অতি প্রত্যুষ হইতে পথচারী ও যানবাহনের ব্যাপক বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন এলাকায় ছোঁকরা ও গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেয়া হয়। ইপিআরটিসি বাসগুলিতে ইট-পাটকেল ছোঁড়া হয় এবং টায়ারের পাম্প ছেড়ে দিয়ে সর্বপ্রকার যানবাহনের অচলাবস্থা সৃষ্টি করা হয়। নিরীহ জনসাধারণ ও অফিস যাত্রীদের অপমান ও হয়রানি করা হয়। হাইকোর্টের সম্মুখে তিনটি গাড়ি পোড়াইয়া দেওয়া হয়। পুলিশ কার্জন হল, বাহাদুর শাহ পার্ক ও কাওরান বাজারের নিকট গুণ্ডাদের বাধা দান করে এবং টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করিয়া তাহাদেরকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

তেজগাঁও দুই-ডাউন চট্টগ্রাম মেইল তেজগাঁও রেলস্টেশনের আউটার সিগন্যালে আটক করিয়া লাইনচ্যুত করা হয়। ট্রেনখানা প্রহরা দানের জন্য একদল পুলিশ দ্রুত তথায় গমন করে। জনতা তাদের ঘিরিয়া ফেলে এবং তুমুলভাবে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে, ফলে বহু পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। যখন পুলিশ জনতার কবলে পড়িয়া যাবার উপক্রম হয় তখন আত্মরক্ষার জন্য তাহারা গুলিবর্ষণ করে। ফলে ৪ ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

নারায়ণগঞ্জের এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা সকাল ৬-৩০ মিনিটের সময় গলাচিপা রেলওয়ে ক্রসিং-এর নিকট ঢাকাগামী ট্রেন আটক করে। পরে জনতা নারায়ণগঞ্জগামী ৩৪নং ডাউন ট্রেন আটকাইয়া উহার বিপুল ক্ষতিসাধন ও ড্রাইভারকে প্রহার করে। জনতা জোর করিয়া যাত্রীদের নামাইয়া দেয়। যাত্রীদের উদ্ধারের জন্য আগত একটি পুলিশ দল আক্রান্ত এবং বহুসংখ্যক পুলিশ-কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ দল লাঠিচার্জের সাহায্যে জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। অতঃপর বন্দুকসহ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত জনতা নারায়ণগঞ্জ থানা আক্রমণ করিয়া দারুণ ক্ষতিসাধন এবং বন্দুকের গুলিতে পুলিশ অফিসারদের জখম করে। উচ্ছৃঙ্খল জনতা থানা ভবনে প্রবেশ করার পর পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলিবর্ষণ করার ফলে ৬ ব্যক্তি নিহত হয় ও আরও ১৩ ব্যক্তি আহত হয়।

৪৫ জন পুলিশ আহত হন এবং তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। ...টঙ্গীতে বিভিন্ন মিলের শ্রমিকরা ধর্মঘট পালন করে এবং একটি মিছিল বের করে। ...ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একশ্রেণীর ছাত্র পিকেটিং করে এবং সেখানে আংশিক ধর্মঘট পালিত হয়।

দুপুরে আদমজী, সিদ্ধিরগঞ্জ ও ডেমরা এলাকার শ্রমিকগণ ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন করিয়া শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ঢাকা নগরীর দুই মাইল দূরে ই.পি.আর বাহিনীর একটি দল শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। অপরাহ্নে এক জনতা গেণ্ডারিয়ার নিকট একখানি ট্রেন আটক করে। চট্টগ্রামগামী গ্রীন-এ্যারো ও ঢাকা অভিমুখী ৩৩-আপ ট্রেনখানিকে অপরাহ্নের দিকে তেজগাঁও স্টেশনে আটক করা হয়।সন্ধ্যার পর একটি উচ্ছৃঙ্খল জনতা কালেক্টরেট ও পরে স্টেট ব্যাংক আক্রমণ করে। রক্ষীগণ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য গুলিবর্ষণ করে।

বেলা ১১টায় ৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একত্র সমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। শহরের অন্যান্য স্থানে পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক ছিল।

সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০।

৭ জুনের পরবর্তী ঘটনাবলি

৭ জুনের হরতালের সময় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ জুন ন্যাপ-দলীয় নেতৃবৃন্দ যৌথভাবে এক প্রচারপত্র প্রচার করেন (ইস্ট পাকিস্তান প্রেস, ২৬৩ বংশাল রোড, ঢাকা থেকে)। দীর্ঘ এই প্রচারপত্রে নেতৃবৃন্দের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এখানে অংশবিশেষ উল্লেখিত হল।

জালিমশাহীর গুলিতে আবার জনতার রক্ত ঝরিয়াছে। গত ৭ জুন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁয় পুলিশের গুলিতে এদেশের শান্তিকামী মানুষকে আবার জীবন বিসর্জন দিতে হইয়াছে। সরকারি হিসাবমতেই গুলিবর্ষণে নিহতদের সংখ্যা এগারো জন।

অগণিত মানুষ আহত হইয়াছেন। দেড় হাজার ব্যক্তিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। ঢাকাসহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। জনতাকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে সামরিক ট্রায়ালের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দমননীতির প্রয়োগে দেশব্যাপী আঙ্গের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

রাজবন্দিদের মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আওয়ামী লীগের আহ্বানে গত ৭ই জুন তারিখে প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে শান্তিপূর্ণ হরতাল পালিত হয়। হরতালের সাফল্য শাসকচক্রকে হতচকিত করিয়া তোলে এবং ইহাকে বানচাল করার জন্য সরকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পুলিশ বাহিনী লেলাইয়া দেয় ও পুলিশ নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। রুটি, রুজি ও গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য সংগ্রামরত জনতার উপর গুলিবর্ষণ ইহাই প্রথম নয়। ১৯৪৮ সালে চট্টগ্রামের মাদ্রাসায় কৃষকদের উপর; ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ও ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় ছাত্রদের উপর; টংগী, খুলনা ও চট্টগ্রামে কালুরঘাট শ্রমিকদের উপর; সুশং, সানেশ্বর, নাচোল, মাগুরা ও বালিশিয়ার কৃষকদের উপর এবং ১৯৫০ সালের ২৪ এপ্রিল রাজশাহী জেলের

অভ্যন্তরে দেশপ্রেমিক রাজবন্দীদের উপর গুলি চালাইয়া ইতোপূর্বে শত শত ব্যক্তিকে হত্যা করা হইয়াছে।

পেশোয়ারের চারসাদার জনসভার উপর গুলিবর্ষণ এবং বেলুচিস্তানের ঈদের জামাতে বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাব ও করাচীতে ছাত্র হত্যা করা হইয়াছে। বেলুচিস্তান ও সরহাদের ন্যাপ-নেতৃবৃন্দকে ফাঁসিকাঠে ঝুলানো হইয়াছে।

৭ই জুনের দমননীতি এই নির্মম দমননীতিরই অন্যতম বীভৎস নজির। গত ১৯ বৎসর যাবত পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর চরিত্রের স্বরূপ সাময়িক ব্যতিক্রম বাদে মোটামুটি একইরূপ হইলেও নৃশংসতায় বর্তমান সরকার তার পূর্বসূরীদের অনেক পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে। গদি রক্ষার তাগিদে ঈদের জামাত অথবা রাজপথের শান্তি পূর্ণ জনতার উপর পাশবিক হত্যালীলা চালাইতেও এই সরকার বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নাই।...

সূত্র : স্বাধীনতার দলিলপত্র, ২য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১।

৮ জুন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে বিরোধীদল কর্তৃক উত্থাপিত পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশের গুলিবর্ষণ সংক্রান্ত তিনটি মূলতবি প্রস্তাব স্পিকার বাতিল করেন। প্রতিবাদে বিরোধীদলীয় সদস্যগণ পরিষদকক্ষ বর্জন করেন। একই দিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনেও মূলতবি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে বিরোধীদলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্যগণ পরিষদকক্ষ বর্জন করেন।

৭ জুন পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে ৮ জুন সংবাদ প্রকাশ করা হয়নি। ৯ জুনের সংবাদে এ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দেয়া হয় :

যে মর্মান্তিক বেদনাকে ভাষা দেয়া যায় না সেখানে নীরবতাই একমাত্র ভাষা। তাই গতকল্য 'সংবাদ' প্রকাশিত হইতে পারে নাই। আমাদের এই নীরব প্রতিবাদ একক হইলেও ইহাতে আমাদের পাঠকরাও শরিক হইলেন, ইহা আমরা ধরিয়া লইতেছি।

সরকারি দমন নীতি

৭ জুনের ঘটনার পর সরকার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালের ১৩ জুনের মধ্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় স্তরের নেতারাও গ্রেফতার হয়ে গেলেন। ১৫ জুন 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেফতার করা হল। ১৬ জুন 'ইত্তেফাক' নিষিদ্ধ ঘোষণা করে নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হল। আওয়ামী লীগ কর্মী গ্রেফতার করা অব্যাহত থাকে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই ৯,৩৩০ জন আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়।

ছয় দফার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পাকিস্তান আমলে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণার মাধ্যমে। ছয়দফার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের পর্যায় শুরু হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি যে চরম বৈষম্যমূলক আচরণ করে তার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় ছয় দফা দাবি ঘোষণার মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা দাবিকে 'বাঙালির বাঁচার দাবি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ছয়দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্পদ, আভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও

বৈদেশিক আয়ের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দাবি করা হয়। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষমতাও দাবী করা হয়। ১৯৬৬ সালে ঘোষিত ছয় দফা দাবির সঙ্গে ১৯৪৭-৬৫ সময়ে ঘোষিত দাবির মধ্যে পার্থক্য এই যে, পূর্বে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিকার সুযোগ-সুবিধাদানের দাবি জানান হয়, ছয় দফায় সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের যেন নিজে নিজেই আর্থিক স্বাবলম্বিতা অর্জন করতে পারে কেন্দ্রের কাছে সে অধিকার চাওয়া হয়। অর্থাৎ ছয়দফা দাবির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করা হয়।

ছয়দফা দাবিকে বাঙালির 'মুক্তিসনদ' বলা হয়। ছয়দফা আন্দোলনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। ইতোপূর্বে ভাষার দাবিতে ভাষা আন্দোলন, ছাত্রদের দাবি ভিত্তিক শিক্ষা আন্দোলন হলেও ছয়দফার আন্দোলন ছিল সর্বস্তর ও পেশার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলন। পূর্বের আন্দোলনগুলির ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ছয়দফার আন্দোলন ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পরিচালিত সুসংগঠিত আন্দোলন। এ আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা পালন করে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং সারাদেশে জনসভা করে এ আন্দোলনকে প্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে দেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতার পরিণত হন। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান সরকার আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদেরকে ধরপাকড় ও জেল-জুলুমের মাধ্যমে সাময়িকভাবে আন্দোলনকে স্তিমিত করতে পারলেও ছয়দফা দাবিগুলোকে বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। এর প্রমাণ হচ্ছে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় ছাত্রদের যে এগারদফা দাবি ঘোষিত হয় তার মধ্যে ছয়দফার মূল বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ছয়দফাকে দাবিসমূহে সন্নিবেশিত করা হয়। ছয়দফা এতোটাই জনসমর্থন লাভ করেছিল যে, বঙ্গবন্ধু ছয়দফাকেই নির্বাচনী ম্যান্ডেট হিসেবে ঘোষণা করেন। ছয়দফা ও এগার দফার আন্দোলনের সময় বাঙালির মধ্য যে সচেতনতা ও ঐক্য গড়ে ওঠে তার ফল পাওয়া যায় সত্তরের নির্বাচনে। নির্বাচনী প্রচারণায় বলা হয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য দূর করা সম্ভব ছয়দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তানবাসী তা বিশ্বাস করে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়ে জয়ী করে। আর ছয়দফার বিরোধীদের অপমানজনক পরাজয় ঘটে।

নির্বাচনের মাধ্যমে ছয়দফা কর্মসূচির প্রতি জনগণের রায় পাওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তা আর অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। কিন্তু নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ফলে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন স্বাধীনতার আন্দোলনে পরিণত হয়। সেকারণে বলা যেতে পারে যে, ছয়দফা আন্দোলনে স্বাধীনতার বীজ নিহিত ছিল।

২. আগরতলা মামলা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আগরতলা মামলাটি একটি মাইলফলক। পাকিস্তান সরকার ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ঘোষণা করে, পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার

জন্য একটি ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুইজন আওয়ামী লীগ নেতা, সিভিল সার্ভিসের দুইজন কর্মকর্তাসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ১৮ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়, শেখ মুজিবুর রহমান এর সঙ্গে জড়িত এবং তাঁকে এক নম্বর আসামি করে মামলা দায়ের করা হয়। এর জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। এই মামলার সরকারি নাম 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য'। লোকমুখে এই মামলা পরিচিতি লাভ করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে। বঙ্গবন্ধু এই মামলার নামকরণ করেছিলেন 'ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা' নামে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের মুক্তির জন্য ছিল এই প্রচেষ্টা, তাই এটি ষড়যন্ত্র হতে পারে না। সে জন্যই একে উল্লেখ করা হয়েছে শুধু আগরতলা মামলা নামে।

এই মামলায় অভিযোগ করা হয়েছিল— পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কতিপয় সেনা অফিসারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে শেখ মুজিব ভারতের সহযোগিতায় সশস্ত্র উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য ১৯৬২ সালে তিনি গোপনে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা যান। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গেও যোগাযোগ হয়। সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনের ভূমিকা ছিল বেশি।

এখন এটি প্রমাণিত যে, এই মামলার ভিত্তি ছিল। তবে বিভিন্ন তথ্য দেখে, স্মৃতিচারণ পড়ে মনে হয়, পাকিস্তান সরকার বা কুশীলবরা যেভাবে বিষয়টি সাজিয়েছিল আসলে সেটি তেমন কিছু ছিল না। তবে, অভিযুক্তরা দেশকে মুক্ত করার জন্য ভেবেছিলেন, একটি পরিকল্পনা করেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তাঁরা অবশ্যই জাতীয় বীর।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত তৎকালীন ক্যাপ্টেন শওকত আলীর স্মৃতিকাহিনী পড়ে এ ধারণা হয় যে, তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে পাকিস্তান সরকার মামলা সাজিয়েছিল। লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন প্রধানত নৌ সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন ১৯৬২-৬৩ থেকে এবং অধিকাংশই ছিলেন নিম্ন পর্যায়ের অফিসার। ক্যাপ্টেন শওকতরা প্রধানত একই উদ্দেশ্যে আলাপ করছিলেন মূল বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে। সিভিল সার্ভিসের কহল কুদ্দুস, আহমেদ ফজলুর রহমান ও খান শামসুর রহমান অন্যান্যরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন এবং শেখ মুজিবের সঙ্গেও হয়তো তাঁদের আলাপ হয়েছিল; কারণ এরা সবাই ছিলেন বাঙালি প্রেমী। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ কোনো পরিকল্পনা তাঁরা নিতে পারেননি। শওকত আলীদের কাছে মনে হয়েছে মোয়াজ্জেম হোসেন তাড়াহুড়া করছেন এবং গোপনীয়তা সম্পর্কেও তিনি সজাগ নন। ফলে সেনা সদস্যরা ধরা পড়েন। বঙ্গবন্ধু এই প্রয়াসের সঙ্গে হয়তো সরাসরি যুক্ত ছিলেন না। প্রশ্ন হয়তো ছিল। কিন্তু তিনি যে মুক্তির প্রচেষ্টায় আগরতলা গিয়েছিলেন তা তো সত্য; স্বাধীনতার কথা ভেবেছেন তাও তো সত্য। গোয়েন্দা দফতর তা জানত। পাকিস্তান সরকার তাঁকে হেনস্থা করার জন্য এ মামলা করেছিল। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানে তারা প্রচার করতে চেয়েছিল— শেখ মুজিব ভারত বা হিন্দুদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তান

ভাঙতে চাচ্ছেন।

এই মামলার ফল হয়েছিল উল্টো। বাঙালির মনে এই ধারণা হল যে শেখ মুজিব যেহেতু বাঙালির মুক্তিসনদ ছয়দফা আদায় করার জন্য লড়ছেন সে কারণেই তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। আর বঙ্গবন্ধু তো ১৯৬৬ সাল থেকে জেলে। এই সময় আইয়ুব খান-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধছিল। এখন বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি প্রধান হয়ে উঠল। আওয়ামী লীগ, ন্যাপসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে 'ড্যাক'।

ইতোমধ্যে মামলার শুনানি শুরু হলে পত্রিকাগুলি ফলাও করে প্রচার করতে থাকে অভিযুক্তদের প্রতি কী অত্যাচার করা হচ্ছে। ফলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হতে থাকে। পাকিস্তান সরকারও আন্দোলন দমনে গুলির পথ বেছে নেয়। ইতোমধ্যে ছাত্রসহ কয়েকজন নিহত হয়েছেন। পুলিশের নিপীড়নে আহত হয়েছেন অনেকে। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক ও সার্জেন্ট মোহাম্মদ ফজলুল হককে গুলি করে হত্যার চেষ্টা হয়। হাসপাতালে জহুরুল হক মারা গেলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী রাস্তায় নেমে আসে। আইয়ুব খান পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে ১৯ ফেব্রুয়ারি এক গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন ও প্যারোলে শেখ মুজিবকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন।

মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আন্দোলন আরো জোরদার হয়ে উঠলে ২২ ফেব্রুয়ারি সরকার আগরতলা মামলা শুধু প্রত্যাহার নয়, বিনা শর্তে সকল অভিযুক্তকেও মুক্তি দেয়। এই মামলার ৩৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত এলএস সুলতান উদ্দিন আহমেদ এলএফসিডিআই নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মাহফুজ উল্লাহ, অবসরপ্রাপ্ত কর্পোরাল আবদুস সামাদ, অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার দলিল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক, বিভূতিভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী) বিধানকৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, অবসরপ্রাপ্ত ক্লার্ক মুজিবুর রহমান, অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এবি খুরশীদ, খান মোহাম্মদ শামসুর রহমান সিএসপি, একেএম শামসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারী, সার্জেন্ট শামসুল হক, শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী মিয়া, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এম নুরুজ্জামান, সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম রহমান, অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার তাজুল ইসলাম, আলী রেজা, ক্যাপ্টেন খুরশিদ উদ্দিন আহমেদ ও লেফটেন্যান্ট আব্দুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন বেলা এগারটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয় পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২-ক এবং ১৩১ ধারা অনুসারে। মামলার

চার্জশিটে ছিল ১০০ অনুচ্ছেদ। সাক্ষীর সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্তদের আইনজীবীদের নিয়ে একটি আত্মপক্ষ সমর্থকদের দল গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বিশেষ ট্রাইব্যুনাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁকে সহযোগিতা করেন আবদুস সালাম খান, আতাউর রহমান খান প্রমুখ। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌশলী ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি. এইচ খান। ট্রাইব্যুনাালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও মকসুমুল হাকিম। ২৯ জুলাই ১৯৬৮ মামলার শুনানি শুরু হয়। এ সময় স্যার টমাস উইলিয়াম ট্রাইব্যুনাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ৫ জুলাই বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনাতে বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেছিলেন। তবে বঙ্গবন্ধু মুক্তি পেয়ে গেলে ট্রাইব্যুনাালের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার আর কিছু ছিলনা।

সহায়ক গ্রন্থ

মুনতাসীর মামুন, বাংলাদেশ : বাঙালি মানুষ, রাষ্ট্র গঠন ও আধুনিকতা, ঢাকা ২০০৭

হাসান হাফিজুর রহমান, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ২য় খণ্ড।